দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JUN 27 1999
পৃঃ ... কলাম ৫

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ও মহানবী (সাঃ)-এর আদর্শ

শেখ মুহাম্মদ কালাম

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া জাতীয় বিকাশ, উন্নতি ও সমৃদ্ধি অসম্ভব। একটি মহৎ ও উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে গোটা জাতির ভবিষ্যৎ। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃত স্বরূপ কি? জগাখিচুড়ি মার্কা, বস্তুবাদনির্ভর, এক ছিন্নমূল ধারার উপর দাঁড়িয়ে আছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। সেক্যুলার ও অর্থলোলুপ এ শিক্ষা ব্যবস্থা অনুক্ষণ হতাশা ও নৈরাজ্যে ভরপুর। সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, সততা, নীতিনৈতিকতা ও পরম আত্মোপলব্ধি এতে অনুপস্থিত। যে বিশ্বাস থাকলে সুমহান আদর্শবাদিতা অর্জন করা যায়, সে বিশ্বাস নেই এই শিক্ষায়। যে মৌলিক আদর্শের টানে ও অনুশীলনে আপনা-আপনি উজ্জীবিত হওয়া যায় সেই আদর্শের কোন ইংগিত পর্যন্ত নেই এই শিক্ষা ব্যবস্থায়।

শিক্ষাকে আমরা গ্রহণ করি চাকরি লাভের হাতিয়ার রূপে কিংবা কৌশলে অর্থোপার্জনের অবলম্বন রূপে। তাই নয় কি? আমরা জীবন-প্রাণের মত গুরুত্ব দিচ্ছি কি শিক্ষার? শিক্ষা তো জীবনের চেয়েও অধিক মূল্যবান। শিক্ষাবিহীন মানবজীবন পশুজীবনের চেয়েও নিকৃষ্ট। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শিক্ষার গুরুত্ব দিয়েছেন জীবনের চেয়েও অধিক। বদরের শিক্ষিত যুদ্ধবন্দীদের জন্য দুটো পথ খোলা ছিল– অধিকারভুক্ত দাসরূপে বিক্রি করে দেয়া কিংবা মৃত্যুদণ্ড দেয়া। এ দুটোর কোনটিই করেননি রাসূল (সাঃ)। তিনি তাদের মুক্ত করে দিয়েছিলেন তাদের শিক্ষা বিনিময়ের বদৌলতে। দশজন নিরক্ষর মুসলিমকে শিক্ষাদানের শর্তে এক একজন যুদ্ধবন্দীকে মুক্ত করা হয়েছিল সেদিন। দাসত্ব কিংবা নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে তাদের মুক্তি দেয়া হয়েছিল কেবল শিক্ষার বিনিময়ে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি আল্লাহর প্রথম ওহী ও প্রথম নির্দেশ ছিল পড়ালেখা অর্জনের উপর– সার্বিক শিক্ষাগ্রহণের উপর। তাঁর প্রাত্যহিক অভ্যাস ও কাজকর্মের অন্যতম প্রধান ছিল শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদান। তিনি আল্লাহর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। তিনি সরাসরি আল্লাহর থেকে শিখেছেন। আত্মোপলব্ধি দিয়ে শিখেছেন। চিন্তা-গবেষণা ও ধ্যান করে শিখেছেন। কুরআন ছাড়াও তাঁর শিক্ষার অন্যতম প্রধান উৎস ছিল প্রকৃতি– আল্লাহর বিশাল সৃষ্টি জগৎ। তিনি শিক্ষক রূপেই জগতে এসেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি তো কেবল শিক্ষক রূপেই আগমন করেছি।

তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার সাথে বাস্তবতার মিল ছিল শতকরা একশ' ভাগ। শিক্ষা অর্জনের পরপর তা বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত করার অপরিহার্য অনুশীলন ছিল যুগপৎভাবে। একটি হাদীস থেকে জানা যায়, সাহাবা-ই-কিরাম কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষাগ্রহণ করে তা জীবনে বাস্তবায়িত না করে অন্য একটি আয়াত শিখতেন না। কুরআন সুন্নাহ ও মহৎ আদর্শের কথা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যমান নেই বললেই চলে। ছিটেফোঁটা যা-ও আছে তা বাস্তব জীবনে অনুশীলনের কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি আমাদের শিক্ষা কার্যক্রমে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কথা বহুলভাবে উদ্ধৃত হয় আমাদের দেশে। নেতা-নেত্রী ও মন্ত্রীদের খৈফোটা ভাষণ শুনলে মনে হয় মুহূর্তের মধ্যেই সব শিশু-কিশোর শিক্ষিত হয়ে উঠবে। এই ভাষণ পর্যন্তই শেষ। বাস্তবে মূর্খতা ও কুশিক্ষাই বেড়ে চলছে আমাদের সমাজে। মূলত শিক্ষাকে জীবনের অপরিহার্য অংগরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে, জাতিসত্তার মূল অস্তিত্ব রূপে দাঁড় করাতে না পারলে, সে শিক্ষার স্থায়িত্ব আশা করা যায় না। শাসক কিংবা আমলারা কি বুঝেন জীবন ও সম্পদের মতই শিক্ষা অপরিহার্য, অনিবার্য মৌলিক প্রয়োজন? রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সময় সাহাবা-ই-কিরাম জীবন-প্রাণ উৎসর্গ করে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। অর্থ সম্পদের তোয়াক্কা না করে কেবল শিক্ষার তোয়াক্কাই তাঁরা করেছেন। অনেক সাহাবী (রাঃ)দের জীবনে দেখা যায়, যে সময়টাতে হাট-বাজারে যেয়ে ব্যবসা করা সম্ভব ছিল কিংবা অন্যভাবে অর্থোপার্জন সম্ভব ছিল, ঠিক সে সময়েও মসজিদে নববী শিক্ষালয়ে তারা উপস্থিত থেকেছেন শিক্ষাগ্রহণের জন্য। আসহাবে সুফফার সদস্যগণ তো জীবনের সিংহভাগ জাগতিক চাহিদা বিসর্জন দিয়ে মসজিদে নববীর বৃহত্তর শিক্ষাঙ্গনে পড়ে রয়েছেন শিক্ষাগ্রহণ ও জীবনে প্রতিফলনের নিমিত্তে। শিক্ষাগ্রহণের ফরজকে তারা প্রধান ফরজ রূপেই গণ্য করেছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর স্বতঃসিদ্ধ বিধান হচ্ছে, 'তালাবুল ইলমি ফারীদাতুন আলা কুল্লি মুসলিম– প্রতিটি মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য বিদ্যা শিক্ষা করা ফরজ অপরিহার্য।'

তাঁদের শিরা-উপশিরায়, রক্তে-মাংসে এ নির্দেশ মিশে গিয়ে তাঁদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছিল তাঁদের শিক্ষা কার্যক্রম। একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম নামাজকে যেভাবে ফরজজ্ঞান করে সেভাবে কোন মানুষ শিক্ষাকে ফরজজ্ঞান করলে সে শিক্ষা ফলপ্রসূ না হয়ে পারে না।

আমাদের দেশের শিক্ষাঙ্গন অশান্ত ও উত্তপ্ত থাকে প্রায় সব সময়। চাঁদাবাজি, দলাদলি, মারামারি, হতাশা ও নৈরাজ্য শিক্ষাঙ্গনের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গন থেকে স্বাভাবিক জীবন নিয়ে মায়ের কোলে ফিরে আসার নিশ্চয়তা নেই কোন শিক্ষার্থীর। সন্ত্রাস, ধর্ষণ ও হত্যা উচ্চ শিক্ষালয়ের সাধারণ চিত্র। কিন্তু কেন? এক কথায় এর জবাব হচ্ছে আদর্শ বিবর্জিত ধর্মনিরপেক্ষ বা ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষা যদি মানুষ গড়ার অবলম্বন হয় তবে ধর্মই হবে শিক্ষার মূল উপজীব্য। ধর্ম মানুষকে উন্নত ও মহৎ করে। ধর্ম মানুষের মনন ও আচরণে নীতিবোধ সক্রিয় রাখে, মানবিক মূল্যবোধ ও সততা সৃষ্টি করে। ধর্মকে বিতাড়িত করে যদি শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তোলা হয় তবে তা সন্ত্রাস, হত্যা ও ধর্ষণই উসকে দেয়। নীতি-নৈতিকতা, সম্প্রীতি ও মানবতা উৎসারিত করে না, করতে পারে না।

সুলতানী আমলে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা মোটামুটি ধর্মনির্ভর ছিল। মুসলিম শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা মসজিদ ও মক্তব কেন্দ্রিকই ছিল। বৃটিশ ভারতেও মুসলিম জাতির শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন কঠিন আঘাত আসেনি, যে আঘাত এসেছে বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশে। দিন যতই সামনে এগোয় ততই ইসলামী শিক্ষা সংকুচিত হয়ে আসে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শিক্ষা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। বর্তমানে ইসলামী শিক্ষাকে রুদ্ধ করার বহু আয়োজন প্রায় সম্পন্ন।

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেনি। মহানবী (সাঃ), ইসলাম, ইসলামের মূল্যবোধ ও আদর্শ এতে অনুপস্থিত। অবশ্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে একটি সাবজেক্ট রয়েছে সমগ্র ইসলামের উপর। কোন কোন শ্রেণীর ইসলাম শিক্ষা গ্রন্থের দু'একটি অধ্যায় আছে মহানবী (সাঃ)-এর জীবন চরিতের উপর। কিন্তু মহানবী (সাঃ)-এর আদর্শ কিভাবে বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত করা যায়, শিশু-কিশোরদের কচি মনে গেঁথে দেয়া যায় কিংবা শিখে সাথে সাথে আমল করা যায় তার কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি বরং ইসলাম, মুসলিম ও মহানবী (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে বিষোদগার করার সুযোগ রয়েছে অন্যান্য পাঠ্যক্রমে। মাধ্যমিক স্তর থেকে ইসলাম শিক্ষা উঠিয়ে দেয়ার জন্য একাধিকবার পদক্ষেপ নেয়া হয় সরকারের পক্ষ থেকে। ১৯৯৭-তে নবম-দশম শ্রেণীর ইসলাম শিক্ষা পূর্ণপত্র থেকে অর্ধপত্রে অর্থাৎ ১০০ নম্বর থেকে ৫০ নম্বরে নামিয়ে আনা হয়েছিল। তৌহিদী জনতার কঠোর প্রতিবাদের মুখে তা কার্যকর হতে পারেনি।

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ইসলাম শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার দাবী দীর্ঘদিনের কিন্তু তা কোন সরকারই পূরণ করেনি। ১৯৯৮-তে এ দাবীর উপর প্রচণ্ড চপেটাঘাত করা হয়। পূর্বে যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থা থেকে ইসলাম শিক্ষাকে আরও সংকুচিত করা হয়। বিজ্ঞান বাণিজ্য ও মানবিক সকল শাখায় ঐচ্ছিক বা অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে ইসলাম শিক্ষা অধ্যায়নের যে সুযোগ ছিল ৯৮-তে তা রহিত করা হয়। এখন উচ্চ মাধ্যমিক মানবিক শাখার ছাত্রছাত্রীরাই কেবল ঐচ্ছিক বা অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে ইসলাম শিক্ষা পড়তে পারবে। অন্যান্য শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য ইসলাম শিক্ষার দুয়ার বন্ধ। '৯৮ সালের গোড়ার দিকে একটি গুজব বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। তা হল, ইসলাম শিক্ষার কুরআন-হাদীস বিষয়ক ১ম পত্র বাদ দিয়ে তার পরিবর্তে ইসলামের ইতিহাস পত্রের অন্তর্ভুক্তি। অবশ্য গুজব গুজবই থেকে যায়– তা বাস্তবের মুখ দেখেনি।

কলেজ পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষা শিক্ষার্থীদের প্রথম পছন্দের সাবজেক্ট। অন্যান্য সাবজেক্টের শিক্ষকরা একরকম ঈর্ষা করে আসছিলেন ইসলামী শিক্ষার প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের বাঁধভাঙ্গা জোয়ার দেখে। এতে ইসলামবিদ্বেষী শক্তির গায়ে আগুন জ্বলে ওঠে। বছরখানেক হল পূর্বের বাঁধভাঙ্গা জোয়ার আর দেখা যায় না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সহজে ডিগ্রী বা মাস্টার্স পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষা সাবজেক্ট খোলার জন্য নতুন কলেজে অনুমতি দেয়া হয় না। গত তিন বছরে বহু কলেজে অসংখ্য সাবজেক্টে অনার্স খোলার অনুমতি দেয়া হয়েছে, কিন্তু ইসলামী শিক্ষা সাবজেক্টের জন্য দু'একটি ব্যতিক্রম বাদে অনুমতি দেয়া হয়নি বললেই চলে। বরিশাল বিএম কলেজ, রংপুর কারমাইকেল কলেজ, খুলনা বিএল কলেজ, সিলেট এমসি কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ, ঢাকা কলেজ প্রভৃতি বড় কলেজগুলোর কোনটিতে ইসলামী শিক্ষায় অনার্স পড়ানো হয় না। অথচ অন্যান্য প্রায় সকল সাবজেক্টে অনার্স পড়ানো হয়। ইশি বিষয়ে মাস্টার্সও আছে সীমিতসংখ্যক কলেজে।

সরকারী কলেজগুলোতে অন্যান্য সাবজেক্ট পড়ানোর জন্য যেখানে চারজন শিক্ষক নিয়োগ করা হয় সেখানে ইসলামী শিক্ষা পড়ানোর জন্য নিয়োগ করা হয় মাত্র দু'জন শিক্ষক। যতদূর জানা যায়, মাত্র তিনটি কলেজ ব্যতীত কোন সরকারী কলেজে ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে দু'জনের বেশী শিক্ষকের পদ নেই। অতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সঙ্গে যে পদগুলো আছে, তাও কেবল প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপকের পদ। সারা বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে প্রফেসরের পদ মাত্র একটি আর সহযোগী অধ্যাপকের পদ মাত্র তিনটি। অন্যান্য সাবজেক্টে যেখানে শত শত প্রফেসর ও সহযোগী অধ্যাপকের পদ সেখানে ইসলামী শিক্ষা সাবজেক্টে মাত্র একটি ও তিনটি পদ ইসলামের সঙ্গে ঠাট্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। আগে একটি নিয়ম ছিল, আরবী ও ইসলামী শিক্ষার সিনিয়র সহকারী অধ্যাপকদের বিষয়-কোটার আওতায় ভাইস প্রিন্সিপাল পদে পদোন্নতি দেয়া হত। বর্তমানে অঘোষিতভাবে তাও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কলেজের প্রিন্সিপাল বা ভাইস প্রিন্সিপাল পদে কিংবা শিক্ষাবোর্ড, অধিদফতর ও প্রকল্পের কোন পদে ইসলামী শিক্ষার শিক্ষক যাতে নিয়োগ না পান সেজন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সবসময়ই সতর্ক থাকেন।

এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'খ' ইউনিটের পাঁচটি সাবজেক্টে মাদ্রাসা ছাত্রদের ভর্তি হতে দেয়া হয়নি। সাবজেক্ট পাঁচটি হচ্ছে- বাংলা, ইংরেজী, সমাজকল্যাণ, অর্থনীতি ও সাংবাদিকতা। ভর্তির উপযুক্ততা প্রমাণের পরে সম্পূর্ণ বিধিবহির্ভূতভাবে তাদের ভর্তির সুযোগ তথা তাদের শিক্ষার সুযোগ কেড়ে নেয়া হয়। তাদের একটিই অপরাধ, তারা মাদ্রাসার ছাত্র, তারা ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত। পত্রিকার রিপোর্টে আরো জানা যায়, ভর্তির সময় স্বয়ং শিক্ষকরা নানাভাবে তাদের সঙ্গে অপমানজনক আচরণ করেন। উক্ত পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে বাংলা ও ইংরেজী দুটো সাবজেক্টে মাদ্রাসা ছাত্রদের ভর্তি না করার একটি খোঁড়া যুক্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দাঁড় করিয়েছেন। তা হচ্ছে– মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ২০০ নম্বরের বাংলা ও ইংরেজী পড়তে হবে। মাদ্রাসা ছাত্ররা যেহেতু দাখিল ও আলিমে ১০০ নম্বরের বাংলা, ইংরেজী পড়েছে সেহেতু তারা ভর্তির অনুপযুক্ত। কি চমৎকার যুক্তি ১০০ নম্বর পড়েও ২০০ পড়ুয়া একটি সাধারণ ছাত্রের চেয়ে যদি মাদ্রাসার ছাত্র তার উপযুক্ততা বেশি প্রমাণ করতে পারে তবে কেন তাকে খোঁড়া অজুহাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে? তাহলে ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার প্রয়োজন কি ছিল? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে কে বুঝায় এসব কথা?

মাদ্রাসা ছাত্রদের উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। সকল সাবজেক্টে ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন ও বাস্তবে আমল করা ছিল বাধ্যতামূলক। কিন্তু আজ তা নামে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থাকলেও কাজে সেক্যুলার বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও অনেক ইসলাম-বিদ্বেষী। ইসলামী শিক্ষার বিষয় ছাড়া অন্যান্য সাবজেক্টে মাদ্রাসা ছাত্রদের ভর্তি করা হয় না বললেই চলে। বহু হিন্দু ও নাস্তিক আজকের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতাধর শিক্ষক। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিদকে, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৌশলীকে ভিসি করা হলেও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী পণ্ডিতকে ভিসি করা হয় না।

বিসিএস পরীক্ষায় আবশ্যিক ৫০০ নম্বর ছাড়াও ঐচ্ছিক ৩০০ নম্বরে তিনটি সাবজেক্ট পরীক্ষা দিতে হয়। সরকারী কর্ম কমিশন থেকে ঐচ্ছিক বিষয়ের জন্য প্রায় ৫০টি সাবজেক্ট নির্ধারণ করা হয় এবং প্রতিটির জন্য স্বতন্ত্র কোড নম্বর দেয়া হয়। এই পঞ্চাশটি সাবজেক্টের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে ইসলামী শিক্ষার জন্য কোন কোড নম্বর নেই। ইসলামী শিক্ষার সাবজেক্টেরও উল্লেখ নেই। বরং "Others" নামের একটি সাবজেক্ট আছে ২০০ কোড নম্বরে– যা দ্বারা ইসলামী শিক্ষা বা এ জাতীয় অনুল্লেখযোগ্য (?) সাবজেক্ট বুঝায়। সংস্কৃত, পালি, ফার্সি প্রভৃতি সাবজেক্টেরও স্বতন্ত্র কোড নম্বর আছে কিন্তু সাবজেক্টভিত্তিক কোড নম্বর নেই কেবল ইসলামী শিক্ষার। অথচ বিরাট সংখ্যক পরীক্ষার্থী ইসলামী শিক্ষা ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। বিসিএস (প্রশাসন), বিসিএস (পুলিশ) ও বিসিএস (পররাষ্ট্র) প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ক্যাডারে মাদ্রাসা সার্টিফিকেটধারীদের সঙ্গে বিমাতাসুলভ আচরণের বহু অভিযোগ আমরা জানি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারের ছয়জনকে চাকরিচ্যুত করা হয়। তাদের অপরাধ, তাদের মাদ্রাসার ডিগ্রী রয়েছে, তারা ইসলামের জীবনযাপন করে।

বর্তমান সরকার কুদরত-ই-খুদা শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনে ইসলাম ও মাদ্রাসা শিক্ষাকে কবর দেয়া হয়েছে। সুতরাং সরকার যদি ক্রমান্বয়ে ইসলামী শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষাকে কবর দেয়ার পথ রচনা করে তবে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিছুকাল পূর্বে তালেবান ধরার নামে কওমী মাদ্রাসা বন্ধের এক সুদূরপ্রসারী প্রচেষ্টা চালায় সরকার। অবাধ্য শিশুদের শিকল পরানোর অজুহাতে অনেক হিফযখানা বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ইসলামী শিক্ষা পড়ানোর কোন নিয়মিত শিক্ষক নেই। তিনটি সরকারী মাদ্রাসার ৭০ ভাগ শিক্ষকের পদ শূন্য নিয়োগের কোন উদ্যোগ নেই সরকারের। এ রকম আর কিছুকাল চললে সরকারী মাদ্রাসা তিনটি আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যাবে। চলতি জুন মাসে চার হাজার মাদ্রাসা বন্ধের পূর্বের গোপন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন শুরু করেছে সরকার। ৪ হাজার মাদ্রাসার সরকারী স্বীকৃতি বাতিল ও অনুদান বন্ধের ঘোষণা একযোগে না পাঠিয়ে পর্যায়ক্রমে ডাকযোগে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে– যাতে সরকারের বিরুদ্ধে এ ইস্যুতে কোন আন্দোলন গড়ে উঠতে না পারে।

বর্তমান সরকার ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে কেন অবস্থান নিচ্ছেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। প্রধানমন্ত্রী তাঁর নিহত পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে ধর্মদ্রোহী শিক্ষা জাতির উপর চাপিয়ে দিতে চাচ্ছেন। তার পিতাও ইসলাম ও মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করেছিলেন কিন্তু পারেননি। তার যোগ্য কন্যা পারবেন কি? এদেশে বহু শিক্ষা কমিশন হয়েছে, বহু শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে কিন্তু এই ধর্মহীন সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা জাতির কোন কল্যাণে এসেছে কি? দিন দিন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নাজুক রুচিহীন বিষাক্ত ও কর্দমাক্ত রূপ ধারণ করছে। তা থেকে পরিত্রাণের উপায় হচ্ছে ইসলামভিত্তিক সুশীল শিক্ষা ব্যবস্থা। আমাদের জাতিসত্তা, নিজস্ব সভ্যতা, সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ একটি শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের প্রয়োজন। ধর্মভিত্তিক নৈতিক শিক্ষাই কেবল শিক্ষাঙ্গনসহ সমগ্র দেশ ও জাতি থেকে যাবতীয় কলুষতা দূর করতে পারে। ইসলামভিত্তিক একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে সরকার এ সুযোগটি গ্রহণ করতে পারেন।